শহীদ জিয়ার ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অমর জিয়া

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী। ১৯৮১ সালের ৩০ মে মধ্যরাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিদ্রামগ্ন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে বুলেটের নির্মম আঘাতে হত্যা করে তারই প্রিয় সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী অফিসার। জিয়াকে হত্যার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছিল ৩০ মে'র কয়েক মাস আগে থেকেই। ষড়যন্ত্রকারীরা নানা ধরনের প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জিয়ার ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস পায়।

১৯৮১ সালের ৩০ মে'র ভয়াল রাতের আগে শহীদ জিয়া চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে বিএনপি নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দল মেটাতে। চট্টগ্রাম যাওয়ার আগে সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রামে যেতে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। তখন যদি জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম যাওয়া থেকে শক্তভাবে নিবৃত্ত করা হতো, তাহলে জিয়া হত্যার ট্র্যাজেডিটি নাও ঘটতে পারত। তবে এ কথা সত্য, পৃথিবীর তাবৎ জাতীয়তাবাদী নেতারা আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মুখে অসহায় বোধ করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদী নেতাদের হয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, অথবা বলপূর্বক তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমরা তো জানি, কী নির্মমভাবে কঙ্গোর স্বাধীনতাকামী গণতান্ত্রিক নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য যেসব জাতীয়তাবাদী নেতাকে ক্ষমতা থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ণ, আলজেরিয়ার বেন বেল্লা, ঘানার এনক্রুমাহ্‌ ও লিবিয়ার মুয়াম্মার গাদ্দাফি। মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে শুধু ক্ষমতা থেকেই উচ্ছেদ করা হয়নি, তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং মরুভূমিতে এমন এক জায়গায় তার লাশ দাফন করা হয়, যাতে কেউ তার হদিস না পায়। উল্লেখ্য, এসব জাতীয়তাবাদী নেতা স্নায়ুযুদ্ধের বলি হয়েছিলেন অথবা একমেরু বিশ্বের আধিপত্যবাদের শিকার হয়েছিলেন। নিজ দেশের স্বার্থকে যে নেতা পরম আরাধ্য রূপে গ্রহণ করেন, তিনি যে পরাশক্তির চক্ষুশূল হয়ে উঠবেন, তাতে সন্দেহ নেই। জিয়াউর রহমান একটি আঞ্চলিক পরাশক্তির কোপানলে পড়েছিলেন। তার মহীয়সী স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও কোনো অন্যায় না করে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং সন্দেহ করা হয়—স্লো পয়জনিং করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছিল।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার। শেখ মুজিবুর রহমানের ফ্যাসিবাদী ও একদলীয় বাকশালি শাসনে পর্যুদস্ত বাংলাদেশে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন জিয়াউর রহমান। বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতি তিনটি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই খুঁটিগুলো হলো—কৃষি, পোশাকশিল্প ও রেমিট্যান্স। অর্থনৈতিক সংকটের আশু সমাধান হিসেবে জিয়াউর রহমান এই তিনটি খুঁটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে স্বল্প মেয়াদে এর চেয়ে ভালো কোনো পদক্ষেপ সেই সময় হতে পারত না। তিনি বললেন, খাদ্য উৎপাদন তিন গুণ করা সম্ভব, তবে দ্বিগুণ করাই যথেষ্ট হবে। তিনি শস্য আবাদের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য সেচ সুবিধা নিশ্চিত করলেন এবং সেচের পানির জন্য খাল খনন কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। তিনি কৃষকদের মধ্যে স্বনির্ভর কর্মসূচির বিস্তার ঘটিয়ে স্বনির্ভর গ্রাম সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে চারণের বেশে ঘুরে বেড়িয়ে কৃষকদের

ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, ফলদ বৃক্ষরোপণ ও মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করলেন। এসবের সুফল আমরা এখন পাচ্ছি। বাংলাদেশের কৃষিতে আজ যখন গত শতকের সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের তুলনায় তিনগুণ ধান উৎপাদিত হয়, ফলফলাদি চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায় এবং মাছ চাষ ও গবাদি পশু পালনে এক ধরনের বিপ্লব লক্ষ করা যায়—সেজন্য আমাদের জিয়াউর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। জিয়াউর রহমান যেসব উদ্যোগ কৃষির ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় এখন শুধু প্রথাগত খাদ্যশস্যের চাষই হচ্ছে না, তার সঙ্গে হচ্ছে উচ্চমূল্য ফসলের চাষ, গবাদি পশু পালন, ব্যাপকভাবে মাছের চাষ এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন। বস্তুত বাংলাদেশে কৃষিই এখন বহুমুখী হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে জিয়াউর রহমান সেসব দেশের শ্রমের বাজারে বাংলাদেশি শ্রমজীবী ও কর্মজীবী মানুষদের অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেন। শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, আজ বাংলাদেশিরা জাপান থেকে চিলি পর্যন্ত অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে জিয়াউর রহমানের সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল হিসেবে। বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা এখন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোকে সবল ও সুঠাম করে তুলেছে। এখন আর অতীতের মতো তীব্র বৈদেশিক মুদ্রার সংকট হয় না।

বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের অভ্যুদয় জিয়াউর রহমানের আরেক যুগান্তকারী অবদান। পোশাকশিল্প গড়ে তুলতে তিনি তার মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু একসময়কার আমলা নুরুল কাদের খানের সৃজনশীল প্রয়াসকে সমর্থন প্রদান করেন। কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানির সঙ্গে আস্থা ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলে দাইয়ুর সহযোগিতায় জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের গোড়াপত্তন ঘটান। দাইয়ু পোশাকশিল্পের প্রথম প্রজন্মের শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে দাইয়ুর ব্যয় পরিশোধ করা হয় কিস্তিতে পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে। জিয়াউর রহমান প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে পোশাকশিল্প যাতে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়, সেজন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ও বন্ডেড ওয়্যারহাউসের পলিসি গ্রহণ করেন। এর ফলে পোশাকশিল্প দ্রুতগতিতে বিকশিত হতে শুরু করে। কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানি যেসব বাংলাদেশি শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে নিজেরাই পোশাকশিল্প কারখানা গড়ে তোলেন।

জিয়াউর রহমান বিশ্ব পরিসরে তার সক্রিয় পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলে ধরেন। তার সময়েই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ জাপানকে পরাজিত করে অস্থায়ী আসন লাভ করে। এই সাফল্য সদ্যোজাত বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে পরম গৌরবের বিষয় ছিল। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আল কুদস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। উল্লেখ্য, আল কুদস কমিটি হলো ওআইসির একটি অন্যতম প্রধান স্থায়ী আন্তঃসরকারি সংস্থা, যার মূল লক্ষ্য জেরুজালেম বা আল কুদস শহরের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার আদায়ে বিশ্ব মঞ্চে কাজ করা। জিয়াউর রহমান ইরাক-ইরান যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। একজন রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তিনি যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ইরাক-ইরান যুদ্ধে তার মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা এরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রনেতা হিসেবে জিয়া ছিলেন একজন তরুণ রাষ্ট্রনায়ক। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো তাদের রাজধানীতে জিয়াকে উষ্ণ অভিনন্দন জানায় এবং জিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে চিন্তাসমৃদ্ধ আলাপ-আলোচনা করে। জিয়া এসব আলোচনায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রতিফলন ঘটান। জিয়াউর রহমান গণচীনের সঙ্গে অত্যন্ত নৈকট্যপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। গণচীন বাংলাদেশের

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বলিষ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক পূর্ণতা পায়। চীনের উত্থান একমেরুভিত্তিক বিশ্বকে বহুমেরুভিত্তিক বিশ্বে পরিণত করেছে। জিয়াউর রহমান এই সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছিলেন তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে।

জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হওয়ার পর কুচক্রীরা তার লাশ রাঙ্গুনিয়ায় পাহাড়ের গোড়ায় গর্ত করে মাটিচাপা দেয়। ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ তখন ছিলেন চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে অবস্থিত মিলিটারি একাডেমির কমান্ড্যান্ট। তার প্রচেষ্টায় জিয়াউর রহমানের লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের সিএমএইচে নেওয়া হয়। সেখানে তার মরদেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া তার দেহ পুনর্গঠন করা হয়। তার লাশ ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তার জানাজায় ১০ লাখ লোকের সমাবেশ হয়। জানাজায় অংশগ্রহণকারী লাখো জনতা ছিল শোকবিহ্বল। তারা সমবেত কণ্ঠে কালেমা তৈয়বা পড়ছিল। তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। বিশ্বের ইতিহাসে একজন নেতাকে এমন বিশালভাবে বিদায় জানানোর ঘটনা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের মানুষ তাকে ভালোবেসেছিল অন্তর দিয়ে। তাকে হারিয়ে তারা অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিল। জিয়াউর রহমানের সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আধিপত্যবাদী শক্তির সাহসী মোকাবিলা ছিল অনন্য। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী এক রাষ্ট্রনায়ক, যিনি সামরিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন বাকশালীদের দেশবিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। তাই বাকশালিদের প্রভুরা তাকে সহ্য করেনি। তাহলে কী হবে? জিয়া চির অমরত্ব লাভ করেছেন বাংলাদেশের মানুষের অন্তরের গভীরে।

#

লেখক : শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রচিন্তক

পিআইডি ফিচার